অনির্মিত পুষ্পগুচ্ছ ও জহর সেনমজুমদার

সম্পাদনা

বৈদ্যনাথ মিশ্র

978-81-955952-3-5

BOOKS SPACE
Kolkata - 700 009
Email : booksspace2011@gmail.com

বিনির্মিত স্বপ্নগুচ্ছ ও জহর সেনমজুমদার

সম্পাদনা

বৈদ্যনাথ মিশ্র

বুকস স্পেস
২বি/৩, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

BINIRMITO SWAPNAGUCHHA O JAHAR SENMAJUMDAR
Edited by *Baidyanath Misra*

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২২

ISBN : 978-81-955952-3-5

বুকস স্পেস কর্তৃক ২বি/৩ নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত এবং
বর্ণায়ন, ২বি/৩ নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত

পরিবেশক : দমদম জংশন, ১৩৯/৫ পূর্ব সিঁথি রোড, কলকাতা-৭০০০৩০

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : সমীরণ ঘোষ

বিনিময় : ৭০০ টাকা

সূচি

অপ্রকাশিত কবিতা

সমীর রায়চৌধুরী ১৫ মোস্তফা তারিকুল আহসান ৩৫
মানবেন্দ্র সাহা ৫১ সাথী নন্দী ৬১ নিলুফা খাতুন ৭৬
শতাক্ষী কুণ্ডু ৮৯ মুহম্মদ মুহসিন ১০২
সোনালি চক্রবর্তী ১১৬
জয়িতা ভট্টাচার্য ১২০ অলোক বরণ সরকার ১৩৪

অপ্রকাশিত কবিতা

তপোধীর ভট্টাচার্য ১৪৯ কবির হুমায়ুন ১৬৪ রমিত দে ২০৯
মিঠুন রায় ২৪১ আবেশ মণ্ডল ২৫৪ সুশোভন পাইন ২৭০
কালিপদ বর্মণ ২৮৭ অসীম সরকার ৩০০
ব্রজকুমার সরকার ৩১৫ সুদেষ্ণা মৈত্র ৩৩৩

অপ্রকাশিত কবিতা

গৌতম গুহরায় ৩৪১ বনানী চক্রবর্তী ৩৫১ দেবার্ক মণ্ডল ৪১৮
অমর পাত্র ৪৩৩ গালিবউদ্দিন মণ্ডল ৪৫৩ দীপ্তি দাস ৪৬৫
অভিষেক মণ্ডল ৪৭৯ অবশেষ দাস ৫০১
প্রসূন মাঝি ৫১২ অলোক বিশ্বাস ৫২০
শামীম রেজা ৫৩২

জহর সেনমজুমদারের কবিতা

বনানী চক্রবর্ত্তী

"খুব বেশি কিছু এ জীবনে চাইনি আমি। একটা নদী; নদী তীরবর্তী একটা গ্রাম; আর আলো অন্ধকার মিশ্রিত একটি মাটির বাড়ি; দু-পাশে উঁচু দাওয়া; মাঝখান দিয়ে ঠিক তিনটে ভাসমান সিঁড়ি ওপরদিকে উঠে গেছে। বাড়ির চারপাশ সযত্নে নয়, অযত্নখচিত নানাবিধ বনজঙ্গল, গাছপালা; সরু সরু ভিন্নধর্মী পথ; এদিক সেদিক; আর গহন সঘন পোকারাও আত্মীয়স্বজন; সব কিছুর সঙ্গে অবশ্যই থাকবে আদিম কিছু সাপ; ভাষাহীন; তবুও অন্তরালবর্তী বনে জঙ্গলে সব সময়েই সেও কিছু বলে; এ জীবনে সত্যিই এর চেয়ে বেশি কিছু চাইনি আমি; গেরুয়া সূর্যাস্তের ভিতর আমিও বসে থাকবো নীরব ও নিস্তব্ধ; কিন্তু দেহে মনে কথা বলবো, যে কথা কাউকে বলা যায় না কখনও কোনো দিন; যদি কোনও জীবনদেবতা থাকেন কোথাও, তিনিই শুনবেন...."[১]

আত্মদ্বিরালাপ 'হৃল্লেখবীজ'-এর প্রথম সূচনাতেই কবি জহর সেনমজুমদার জীবনের যে চাওয়া পাওয়ার উন্মুক্ত প্রান্তরে আমাদের হাজির করেছেন সেখানে রয়েছে অনন্ত বিস্ময়। সে যেন এক স্বপ্নপুরী; একজন কবি, স্রষ্টা তিনিই পারেন এই নিভৃত নির্জন বাসভূমি হৃদয়ের কন্দরে লালন করতে, নিজেই সম্মুখবর্তী হতে পারেন নিজের। তৃতীয় নয়ন উন্মীলিত করে জীবজগতের প্রযুপ্ত চাওয়া পাওয়া, হৃদয়ের গোপন কন্দরের অজ্ঞেয়কে ছুঁয়ে দেখতে চাইতে পারেন। যে-কোনো সহৃদয় সামাজিকই তাঁর অন্তর মথন অনুভব করেন, অন্তর্লীন তারের অনুরণন সুরের ঝঙ্কার তাঁকেও উতলা করে বলে উঠতে পারে চাই চাই চাই, কিন্তু কীভাবে চাই, কেমন করে চাই তা প্রকাশ করার মতো কিন্নর কণ্ঠ বা তৃতীয় নয়ন কিংবা রহস্যময় চাবি একবার ঝলক দিয়েই তাঁর কাছ থেকে হারিয়ে যায় দূর নীহারিকায়। তখনই তিনি, সেই সামাজিক, সেই পাঠক আর্ত চিৎকার করে ওঠেন, আকাশ বাতাস দীর্ণবিদীর্ণ হয়...কোনো এক অদৃশ্য অজ্ঞেয় স্রষ্টা

কবির কথায় আমাদের জীবনদেবতা মুখ টিপে হাসেন, আর তাঁর অপরাগতার যন্ত্রণাকে প্রশ্রয়ের আঙুল বুলিয়ে উপভোগ করেন।

জহর কবি আবার জহর পাঠক; জহর একাধারে স্রষ্টার অংশ সৃষ্টিকর্তা আবার অন্যপক্ষে একজন সাধারণ যন্ত্রণাকাতর সামাজিক। খিদে, তেষ্টা, যৌন কামনা, ভ্রান্ত সংবলিত একজন মানুষ। জহর প্রকৃত অর্থে কি, কবি জহর প্রকৃত অর্থে কি যদি তাঁরই কোনো এক কাব্যগ্রন্থের ভূমিকার কথা দিয়ে বালি—তিনি "আকস্মিক যৌন স্বপ্ন থেকে অফুরন্ত ঐশী তৃষ্ণায় ক্রমাগত প্রশ্ন কণ্টকিত অদ্ভুত এক নির্বিকল্প মানুষ, স্বপ্ন নয়, পরাজয়ের পথে পথে লুকিয়ে রাখা বৃষ্টি ভেজা সাদা অভ্রদানা," এবং "নষ্ট ভ্রষ্ট সময়ের অগ্নি ও জলে, নষ্ট ভ্রষ্ট সময়ের চাবি ও তালায় জংধরা হাড় মাংস নিয়ে, সেই এক পীড়িত মানুষ, দুই হাত কর্দমাক্ত, দুই চোখ ভারাক্রান্ত",

স্রষ্টা কবি জহরের হাতে চাবি দিয়ে সৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করবার অধিকার দিয়ে যেন বলেছেন—নে খোল, দরজার তালা,...দেখে নে...স্পর্শ কর, তুলে নে, মেখে নে দু-হাত ভরে। এই ভবচক্রে সতত ভ্রাম্যমাণ থেকে, ইছামতীর জল ছুঁয়ে ছোটো বড়ো জঙ্গলের রহস্যে ঘেরা প্রকৃতিকে উঁকি দিয়ে দেখ। লাল রাস্তা, গোরু গাভি জাম জামরুল কামরাঙায় সতত আবিষ্কার কর নিজেকে। জীবনের গূঢ় এক পথে ভ্রাম্যমাণ সাধু সন্ন্যাসীর কাছে পাঠ নিয়ে নে ব্যোম ব্যোম মহাব্যোম, জীবন সম্পর্কিত ও জীবন অতিরিক্ত এক সম্মোহনের। সঙ্গে থাকুক তোর ইস্কুল পালানো দুপুরের অনন্ত বীক্ষণ আকর্ষণ, স্তরীভূত প্রস্তরীভূত ভাবুক জীবনের, জল স্থল অন্তরীক্ষের দিনলিপি। কবি পৌঁছে যাচ্ছেন সৃষ্টির সমতলে। জল জন্ম যন্ত্রণার উপশমকারী আনন্দের সরোবরে পৌঁছে যাচ্ছেন যেন কার হাত ধরে। কিন্তু কি করে স্পর্শ করবেন সেই সরোবর, এই ঐশী শরীরের অন্য সত্তা সামাজিক শরীর হয়তো চিনির রসে ভিজে স্ফটিক মূর্তি নেবে। ফিরে আসছেন আবার এই মায়া প্রপঞ্চময় জগতের মাঝখানে। যেখানে জীবন প্রবঞ্চনা অবহেলায় অনেকাংশে নরক হয়ে উঠেছে। কবি হাহাকার করছেন ঈশিতা, পরমেশ্বরী, কল্যাণী, সখা, বন্ধু কোল দাও চুমা দাও জল দাও...এই জাগতিক যন্ত্রণা তুলে নাও তুলে নাও...।

সেই মুহূর্তে কবির কাঙ্ক্ষিত তিনটি স্বপ্ন সিঁড়ির সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। কবি যে বাংলায় জন্ম নিয়েছেন, এবং জিনের তরঙ্গে বয়ে নিয়ে এসেছেন যে নদী জনপদ তার অখণ্ড আকুলতা অস্বীকার করবেন কীভাবে! তাঁর জিনে বইছে বরিশালের শিরা-উপশিরার মতো নদী, জন্মভূমি উত্তর চব্বিশ পরগনার আড়বালিয়া গ্রাম, শ্মশান, ইছামতী নদী, প্রকৃতি, পশুপাখি, গাছপালা, আদিম যৌনতার চিহ্নবাহী রহস্যাবৃত সাপ, সরীসৃপ, গেরুয়া সূর্যাস্ত, কবির মনে কখনও আউল বাউল কখনও ক্ষ্যাপা লালন, সাধুসন্ত মাতন লাগিয়েছে। তিনি বৈষ্ণবীয় প্রেমের নির্বীজ নিস্তব্ধ বিশ্রম্ভালাপকে জলতরঙ্গের মতো হৃদয়ে ধারণ করলেও ক্রমশ ক্রমাগত মায়া প্রপঞ্চময় ঈশিতার

হাতছানি পেয়েছেন। সে তাকে হাসিয়েছে, কাঁদিয়েছে। সে কান্না রামপ্রসাদি বাৎসল্যের সরস্বতী নদী নয়, ভালোবাসার অপার বৈতরণী। সেখানে বৈষ্ণবীয় দর্শনের ওই কথাটি বললেই হয়তো যথার্থ হবে, সে এক মধুরারতির ভজনা, 'পূব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে হয়'। আসলে যিনি পরমেশ্বরী, যিনি তাঁর মাধবী তিনি তো শক্তি; এই ব্রহ্মাণ্ডের আদিভূতা সনাতনী। তিনি সৃষ্টি ও প্রলয়কে দুই হাতে ধারণ করে আছেন। আমাদের এই জীব ও জড় জগৎ তার থেকে সৃষ্টি আবার তার মাঝেই সব বিলয় ঘটেছে। যেন সাগর ও লহরি। যেখান থেকে উৎপত্তি, সেখানেই মিশে যাওয়া। তিনিই 'আদ্যা', অদ্বিতীয়া, অক্ষরা, পুরাণী। তিনিই সচ্চিদানন্দরূপিনী পরমেশ্বরী ব্রহ্মময়ী। 'ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা' (রুদ্রযামল) তিনিই সগুণ ঈশ্বরী 'সর্বশক্তিস্বরূপা সর্বদেবময়ী তনু, (মেহানির্বাণতন্ত্র) তিনিই মহাবিদ্যা 'মহাবিদ্যা মহামায়া মহা যোগেশ্বরী পরা' (কালীতন্ত্র) তিনিই অঘটনঘটনপটিয়সী মায়া, তিনিই মহাসম্রাজ্ঞী, নিখিল জগতের এক অচিন্ত্য শক্তির লীলাময়ী আধার। পাশ্চাত্য দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসর তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন—

'An infinite and eternal Energy from which proceeds everything'[৩] তাঁর বৃহৎ যোনি থেকে একে একে কীটপতঙ্গ প্রাণী এবং মানুষেরও সৃষ্টি। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন শিব ও শক্তির মিলিত আধার। শিব সেখানে মৃদু মৃদু স্পন্দিত, শক্তি মুখরিত। শিব ও শক্তি যেন হংসরূপী বিন্দু, যেন রমণানন্দে বিভোর শিব ও শক্তির যুগনদ্ধ অবস্থা। পরমেশ্বরী তাঁর যোনিকেই প্রত্যেক জীবে বিন্দু বিন্দু দান করেছেন, এই মায়ার জগতে নানা জীব বৈচিত্র্য অনুভবের আকাঙ্ক্ষায়। সেই হিসেবে কবির, আমাদের, এই কীট পতঙ্গ, আদিম সাপ থেকে মানুষ সকলেই সহোদর। আমরা তাঁর থেকেই সৃষ্টি, আবার তাঁর মাঝেই আমাদের বিলয়, আহার নিদ্রা মৈথুন সবই তাঁরই লীলা খেলা, তাঁর মাঝেই নিমজ্জিত, জীব বৈচিত্র্যের, অনন্ত তৃপ্তির, অনন্ত অতৃপ্তির প্রবহমান ধারা বজায় রাখতেই তিনি জীবে জীবে আদিম সৃষ্টির খেলা দান করেছেন, আবার যখন তিনি জীবকে ঐশী দরজার চাবি খুলে দিয়েছেন, তন্ত্রসাধনার দেহসাধনার নানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তার বৃহৎ যোনি শক্তি এবং জীবের শিব যোনির মিলন ঘটবার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়েছে। এই অনন্ত আকাঙ্ক্ষা, চিরকালীন অতৃপ্তির চক্রমণ জলস্থল অন্তরীক্ষে, তাঁর ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতায় কবি অনুভব করতে চেয়েছেন তারই অনুরণন।

যে পাঠক ধারাবাহিকভাবে জহর সেনমজুমদারের কবিতা যাপন করেন, তাঁর কাছে কবিকে পৌঁছে দেওয়া আমার ধৃষ্টতা মাত্র, কিন্তু যিনি একান্ত আগ্রহে জহর ব্রততে সামিল হবেন ভেবেছেন, তাঁর কাছে এতক্ষণ কবিকে ঐশী চেতনার কবি প্রমাণ করে ফেলবার মতো অন্ধের হস্তি দর্শন করিয়ে ফেলেছি মনে হয়। সেক্ষেত্রে বলি জহর কবি, আটের দশকের কবি। তিনি অত্যন্ত সংবেদনশীল মন নিয়ে, ঘ্রাণ নিয়ে পূর্বাপর দেশকাল চেতনাকে সাথী করে কাব্যজগতে পা রেখেছেন। তিনি প্রথম মহাযুদ্ধ, রুশ বিপ্লবের

সফলতা, অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল উন্মাদনা এবং তার অকস্মাৎ প্রত্যাহৃত হওয়ায় জাতির জীবনে প্রবল হতাশা, দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দলের স্বপ্ন দেখানো ও তাঁর অকাল মৃত্যুতে সব নিভে যাওয়ার কথা জানেন। কবি জানেন কম্যুনিস্ট পার্টির প্রবল সম্ভাবনা নিয়ে আবির্ভাবের কথা। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর মানবেন্দ্রনাথ রায়ের হাত ধরে কম্যুনিজমের বীজ রোপণের কাহিনি। একই সঙ্গে সারা বিশ্বজুড়েও চলছে তোলপাড়। রবীন্দ্রনাথের গর্জে ওঠা নাইট উপাধি ত্যাগ। সেলুলার জেলে হত্যাকাণ্ড, হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানিয় বার্লিন স্কোয়ারে গ্রন্থবহ্নি উৎসব, ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদের দমনপীড়ন, কম্যুনিস্টের উপর রোষ নেমে আসা, বেআইনি ঘোষণা, জাপানি কবি নবুচি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করছেন, রবীন্দ্রনাথ তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছেন এই কর্ম প্রক্রিয়াকে। জাপান, জার্মান, ইটালি একত্রিত হয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধভক্তি, নবজাতক, প্রায়শ্চিত্ত লিখছেন, আশ্রয় খুঁজছেন। স্পেনে গৃহযুদ্ধ শুরু হচ্ছে, হিটলার ও মুসোলিনী অনুগামী জেনারেল ফ্র্যাঙ্কোর অভ্যুত্থান হচ্ছে। জার্মানি অস্ট্রিয়া দখল করে নিচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হচ্ছে। কবি জহর সেনমজুমদার এই ইতিহাসগত দীর্ঘ যাত্রাপথ যেমন জানেন, জানেন সাহিত্যে তার অভিঘাতের কথাও। কল্লোল পত্রিকার প্রকাশ নতুন একটি পথের অভিজ্ঞান হয়ে আজও জ্বলজ্বল করছে। পরবর্তীকালে প্রগতিশীল মানবতাকামী লেখক শিল্পীরা গঠন করেছিলেন প্রগতিশীল লেখক শিল্পী সংঘ, মানুষের কথা, স্বাধীনতার কথা তাঁদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল। চল্লিশের দশকের কৃত্রিম মন্বন্তরের ছবি এইসব কবি শিল্পীরা তুলি ও কলমে ধরেও রেখেছেন, যে-কোনো মরমি লেখক কবি তা অস্বীকার করবেন কি করে! সমাজ বদল, জীবনের বাঁক বদল সাহিত্যে ভাবনাও বদল তো আনবেই। তা ছাড়া দেশ বিভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, অমীমাংসিত স্বাধীনতা, গান্ধীজি হত্যা সমস্ত স্বপ্নগুলোকে কেমন ছেঁড়া ছেঁড়া বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল মানুষের।

আসলে শুধু তো ইতিহাসের পাতায় রক্তের দাগ ছোপ নয়, মনোজগতেও তুমুল বিস্ফোরণ ঘটে চলেছিল ওই সময় জুড়ে। ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ, ফ্রয়েডের স্বপ্ন ভাবনা, অ্যাডলার, ইয়ুং প্রমুখের মনের উপর নানা প্রভাবজাত বক্তব্য মানুষকে দিশেহারা করছিল, ভেতরের আমি বাইরের আমিকে চিনতে পারার সাহস করতে পারছিলনা। মনে হচ্ছিল মানুষ তার নিজের এতদিনকার আস্তিক্য ভাবনায় প্রস্তুত শবকে কাঁধে নিয়ে ছুটছে ছুটছে ছুটছে, আর যুক্তিবাদীতার সুদর্শনচক্র ছুটেছে তার সঙ্গে সঙ্গে, তাকে টুকরো টুকরো করে দেবে বলে। মানুষ মানতে পারছে না, সে মৃত, তার এতদিনকার সংস্কারজাত ঈশ্বরের সন্তান হয়ে বেঁচে থাকবার ধারণা মৃত। ফলে সংস্কারের মতো তাকে কাঁধে রাখলেও কোনো শরণাগতি আর আসছে না। মনে হচ্ছে সে যেন তার এই বিজ্ঞান ভাবনার, যন্ত্র ভাবনার, বৈশ্য ভাবনার মানবতার চেয়ে অনেক ক্ষুদ্র অসহায়

দারুব্রহ্ম। তার হাত নেই পা নেই জড়ভরত একটি মৃত শরীর আছে। ঈশ্বরকে আমাদের প্রয়োজনে বাঁচিয়ে রাখবার এই প্রয়াস আর কত কাল করা সম্ভব, আমরা জানি না, জানি না। কবি জহর সেনমজুমদারও জানেন না। তাই অস্তিবাদ বারবার প্রশ্ন চিহ্নের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—

> "বস্তুত, অস্তিহীনতা সত্য হলে জীবন মূল্যহীন, মানুষ নিঃসঙ্গ। এমন সঙ্গহীনতার নাম বিচ্ছিন্নতা। এ এক অভিশাপ। এই অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্যই কবিতায় একালের বাঙালি কবিদের নিরন্তর আত্মিক সংকটজাত সংগ্রামে লিপ্ত হতে দেখি। নানাভাবে তাঁদের সেই সংগ্রামের কথা স্পষ্ট হয় কবিতায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালের সব তরুণ সদ্য আবির্ভূত কবিই কোন না কোন ভাবে অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব নিয়ে ভাবিত হয়েছেন।"[৪]

জহর অস্তিবাদের হাত ধরে থাকবেন কি করে, যেখানে দেখছেন ভয়ংকর কৃষক বিদ্রোহের ফসল হিসেবে কৃষক আন্দোলন, নতুন স্বপ্ন নিয়ে সমাজ বদলের আশা নিয়ে এগিয়ে আশা অসংখ্য তরুণ যুবকের স্বপ্ন ভঙ্গ হচ্ছে, রাষ্ট্র তাদের পাঁজর ফুটো করে একটা একটা করে বুলেট ভরে দিয়ে, আন্দোলনে বেনো জল ভরে দিয়ে বেপথু করে দিচ্ছে। ঈশ্বর চেতনা, লোকায়ত ভূমি চৈতন্যকে এই নষ্টভ্রষ্ট বিশ্ব তো ছারখার করে দিয়েছে।

আমরা আমাদের দেশজ সংস্কার, ভূমিভাষা, মগ্ন চৈতন্য, নিস্তরঙ্গ ঐশী ভাবনার আত্মনিবিড় দ্বিরালাপ থেকে অনেক অনেক দূরে চলে গেছি। এলিয়টের হাত ধরেছি বিচ্ছিন্ন পরিত্যক্ত দ্বীপের অধিবাসী হয়েছি। চারিদিকে আমাদের অপরিমেয় অশ্রু লবণাক্ত সমুদ্র। যার কোনো পার নেই। এই অপার সমুদ্রে একমাত্র তীরের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর দর্শন, কাব্যমনীষা নিয়ে, আমরা তাঁরও হাত ধরিনি। তিরস্কার করে দূরে সরিয়ে দিয়েছি। বেদনাকে যন্ত্রণাকে আলিঙ্গন করতে চেয়েছি। নগ্ন, কুৎসিৎ, নষ্ট ভ্রষ্ট সমাজের ছবি আঁকতে বসেছি নষ্ট মন নিয়ে, ছেঁড়া ছেঁড়া চিন্তা-চেতনা নিয়ে। শোপেনহাওয়ারের দুঃখদর্শন, নৈরাশ্যপীড়িত মন দু-হাতে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছি। এভাবেই কখন আমরা আমাদের জীবনদর্শন থেকে যোজন যোজন দূরে সরে গেছি। কবি জহর সেনমজুমদারও কিভাবে ব্যতিক্রম হবেন? তিনিও ছুঁয়েছেন এই আগুন দু-হাতে, পাঁক দু-হাতে— কালো হয়ে যাওয়া পাঁকে পঙ্কিল হয়ে যাওয়া হাতে রামপ্রসাদের মতো দেবীর বন্দনাগান গাইবেন কি করে! কি করে শক্তির শক্তিময়ী রূপের বন্দনাগান গাইবেন! ঈশ্বর চেতনা এই নষ্ট ভ্রষ্ট আধুনিক বিশ্ব তো নিজ হাতে ধ্বংস করেছে! জহরের মধ্যেও তাই প্রগাঢ় সংশয়, যন্ত্রণা জ্বালা। তিনি এক চোখে প্রকৃতির চিন্ময়ীকে দেখবার চেষ্টা করছেন, আবার আমাদের শিকড়ের দিকে ঈশারায় সংকেত দিচ্ছেন, অন্য চোখে এই সমাজের সৃষ্ট ভাবনার পচনশীলতার অসহায়তার ছবি দেখে ঘৃণায় কাতর হয়ে উঠছেন, ফিনকি দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত ও ঘৃণা। এই ঘৃণা কখনো-কখনো

নিজেরও অপারগতার প্রতি, অস্থির কবি যেন সোচ্চারে বলতে চাইছেন। নিরুচ্চারে বলতে চাইছেন, পারছি না পারছি না, আমরা কিছুই রক্ষা করতে পারছি না...সেই নদী, সেই নদী তীরবর্তী গ্রাম, সেই ভূমি, সেই ভূমি চৈতন্য...ঐশী চেতনাকে গ্রাস করে নিচ্ছে বিজ্ঞান, প্রকৃতিকে অধিকার করছে যন্ত্র এবং লোকায়ত ভূমি বাস্তবতা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে নাগরিক যুগ যন্ত্রণায়....

এই বিচ্ছিন্নতায় আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে কবি ও পাঠক উভয়ত; ঈশ্বর সেখানে কোথায়! ভূমি চৈতন্য সেখানে মৃতদেহের মতো পড়ে আছে। মানুষ তার মূল্যবোধ হারিয়েছে। কবিও আক্রান্ত হয়েছেন, পাঠকও আক্রান্ত। সংক্রমণ কাউকেই পরিত্রাণ দেয়নি। প্রকৃতপ্রস্তাবে একজন কবি, তিনি কাব্য রচনার প্রথম পাঠক। রক্তমাংস চেতনা নিয়ে ঐশী চেতনা সৃষ্ট কাব্যের প্রথম পাঠক। তাঁর গায়েও সংক্রমণের ঘা, রক্ত, পুঁজ। তিনি ক্রমাগত মুছে ফেলতে চাইছেন, পরিচ্ছন্ন হয়ে ঈশিতার হাত ধরতে চাইছেন, আবার মলিনতা গ্রাস করছে। কবি জহর সেখানে কোনো মাধবী পরমেশ্বরীর স্নিগ্ধ হাতের স্পর্শ পাচ্ছেন না। সন্দেহ দানা বাঁধছে, তাহলে কি সেই হাতেও আজ সংক্রমণ। সেও কি আজ মৃত। এ সন্দেহ কবি পাঠক উভয়ত লালন করে চলেছেন...তবু তবু তবু চিৎকার করে মৃদু স্বরে প্রেমের আকৃতি নিয়ে এ জীবন পরিণাম থেকে একজন কবির অস্তিচেতনা, স্পিরিচুয়াল (আধ্যাত্মিক) অনুভূতি দিয়ে বলতে চাইছেন জগৎ ও জীবনের কথা, পৃথিবীর স্লানিমামুক্ত একটি রূপের স্বপ্ন আঁকছেন তিনি। এই স্বপ্ন নিয়েই তো এই আশা নিয়েই তো কবি পাঠক সকলেই বাঁচে, বাঁচতে হয়। আশাই তো সেই রঙিন কাঁচ। ধূসর পৃথিবীকে সুন্দর করবার স্বপ্ন কাঁচ।

কার্লমাক্স ধর্মকে আফিম বলেছিলেন। দার্শনিক কান্ট বিচারবিশ্লেষণ করে ঈশ্বরের যথার্থ স্থান পাননি। তাই বলে ঈশ্বরকে অস্বীকারও করতে চাননি। তিনি মনে করতেন ঈশ্বর থাকুন বা না থাকুন মানুষের প্রয়োজনে তাঁকে রাখতে হবে। নতুবা সমাজে মানুষের জীবনে বিশৃঙ্খলা, হতাশা অবশ্যম্ভাবী। হলও তাই। হিউম যেভাবে কট্টর বিচারবোধ দিয়ে সত্যের মুখোমুখি হতে চেয়েছিলেন, সে সত্য অনেক সময় কুইনাইনের উপরের চিনির আস্তরণ তুলে ফেলার মতোই। তার স্বাদ জিভের যন্ত্রণারই কারণ হয়ে ওঠে। পরে অবশ্য হিউম বৌদ্ধ দর্শনের শূন্যবাদের দিকে ঝুঁকেছিলেন। সে কথা স্বতন্ত্র।

ফলে একথা বলাই যায়, এই নিরীশ্বরবাদ আমাদের কোথায় নিয়ে দাঁড় করায়, যার অনুগামী ছিলেন কামু, কাফ্‌কা, সার্ত্র প্রমুখ লেখক, সে কথার নিগূঢ়ানন্দের উক্তিতেই সমর্থন আদায় করি ঃ

> "মানুষ কোথা থেকে এসেছে বা কোথায় যাবে না জানতে পেরে বর্তমান অস্তিত্বটুকুকেই সব বলে ধরে নেয়। ফলে জীবনটাই অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমান অস্তিত্বের বাইরে আর কিছু নেই ভেবে তারা মরিয়া হয়ে ওঠে।"[৫]

এই সামগ্রিক চেতনাবিশ্ব চেতনে এবং অবচেতনে জহরকে নাড়া দিয়ে চলেছিল, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। আটের দশকের কবি হিসেবে মাত্র উনিশ বছর বয়সে 'জনৈক ঈশ্বরের বাণী' কাব্যগ্রন্থে তাই জহরের আত্মপ্রকাশ ঘটল তাঁকে পূর্বাপর কবিদের উত্তরসূরী বলেই এক হিসেবে আমরা চিনলাম। আবার স্বতন্ত্র কথনবিশ্ব নিয়েও তিনি আবির্ভূত হলেন। তাঁর কবিতায় এলো নকশাল আন্দোলন পরবর্তী ভাঙা সমাজ ব্যবস্থার আক্রান্ত চিত্রকলা, স্বপ্ন দেখবার দুর্মর আকাঙ্ক্ষা আছে, অথচ স্বপ্ন পূরণ না হয়ে উঠবার যন্ত্রণাও নিপুণভাবে ফুটে উঠল, উঠে এলো গতানুগতিকতা ভেঙে দেওয়া ভাব ও ভাষা। প্রচলিত ছন্দকেও বর্জনের, আঙ্গিক বর্জনের প্রবণতায় দীর্ঘ প্রবহমান পয়ার ছন্দ ব্যবহার করলেন। অনেকটা কথা বলার ভঙ্গিতে এই কবিতার কথন বিশ্ব রচিত হল। নিশ্চয়তা বা নিরাপত্তার হাত ছেড়ে অনিশ্চিত লক্ষ্যে, রোমান্টিক স্বপ্নকল্পনার চিরাচরিত পথ বর্জন করে জহর নিজস্ব ভাববিশ্ব নিয়ে আবির্ভূত হলেন। এই কবির ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী কবিদের অনুসরণ আছে, আবার অনুসরণ কখনও যে অনুকৃতি হয়ে ওঠেনি সেটিও জোর গলায় বলা যায়। সে প্রসঙ্গে আসার আগে অনুসরণের কথা মনে করি—

> "সংশয়াচ্ছন্ন যুগের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আধুনিক কবিরা যে দিশেহারা হলেন তাতে সন্দেহ নেই। তার ফলে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি (sense of negaltion) অগ্রজের আপ্তবাক্যে ও ঐতিহ্যগত আদর্শে অবিশ্বাস (loss of faith), রৈখিক প্রগতি নয় চক্রাকার আবর্তনই একমাত্র সত্য এরকম বোধ কবিদের মনে দেখা। কাল (time) আর প্রবহমান ধারা রূপে প্রতীয়মান হল না। কালের চিত্র আধুনিক কাব্যে হয়ে দাঁড়াল পিকাসোর ছবির মতো, এক মুহূর্তে তাঁরা দেখলেন বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে।"[৬]

ফলে কবিতার মধ্যে অসংখ্য চিত্রকল্প, চিত্রকল্পের উল্লম্ফন, বাক্যের গঠনের অদল বদল অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল। একই সঙ্গে দীপ্তি ত্রিপাঠী বলছেন যে কথা সে কথাই বা অস্বীকার করি কি করে! ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণ প্রেমের অতীন্দ্রিয় আদর্শকে ধ্বংস করে কামনার কঙ্কালকে দর্শন করিয়ে দিচ্ছে। অবদমিত কামনা, ছেঁড়া স্বপ্ন দর্শনের মতোই কাব্যও হয়ে উঠল টুকরো টুকরো অনুভূতির ঝলক। প্রতীকী ব্যঞ্জনার ঝলকে বিন্দুর মাঝে সিন্ধু দর্শনের প্রচেষ্টাই কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠল।

জহর এই সম্পদ এবং সীমাবদ্ধতা নিয়েই বাংলা কাব্যে এলেন ১৯৭৯ সালে 'জনৈক ঈশ্বরের বাণী' কাব্যগ্রন্থ নিয়ে। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় বহু রবীন্দ্র অনুসারী কবির মতো, রবি সূর্যে হারাবার মতো করে নয়, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি কথন বিশ্ব নিয়ে। অসম্ভব জীবনানন্দ ভক্ত, কবিতা যাপনকারী বিদ্বান কবি হয়েও জহর একবারও পূর্বসূরীকে বয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন না। সফল হোক, ব্যর্থ হোক প্রথম কাব্যেই স্বতন্ত্র স্বর

উচ্চারিত হল। বিগত ক্ষতবিক্ষত স্মৃতি এবং চিরকালীন বাংলার ঐতিহ্য সংস্কারকে দুই বাঁকে তুলে নিয়ে কবি জহর সেনমজুমদার জঙ্গলাকীর্ণ রহস্যাবৃত, আউল বাউল বৈষ্ণব তান্ত্রিক ভিখারি গৃহস্থের সরু গ্রাম পথে ধরে যেন স্বপ্ন ফিরি করতে করতে চললেন, যেন মিলিয়ে মিলিয়ে ফিরি করতে করতে চললেন হতাশা লাঞ্ছনা এবং প্রাচীন ঐতিহ্য, অত্যাচার যন্ত্রণা এবং গ্রামবাংলার সংস্কৃতি, আমোদ আহ্লাদ এবং চিরকালীন আনন্দ। সেই থেকে আজও ফিরি করে চলেছেন, আমরা পাঠক আমাদের রুচি অনুযায়ী তাঁর কবিতা থেকে একটা একটা করে মণিহারী দ্রব্য তুলে নিচ্ছি, কিন্তু আমোদ করতে পারছি না। জহরের কবিতা আমাদের আমোদ দেয় না, সত্যের মুখোমুখি এনে দাঁড় করায়, অন্ধকার প্রহেলিকাময় পথ ধরে চলতে চলতে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো পথের ইশারা দেয়, কিন্তু মনস্ক চোখ সজাগ না থাকলে আবার মিলিয়ে যায়।